১৯৪১

১লা জানুয়ারি, ১৯৪১।১৭ই পৌষ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে খুকুর বাড়ি গিয়ে প্রায় ১১ ॥০টা পর্যন্ত কাটল।খুকুবল্লে—মা, বিভূতিদাকেখেতে দাও না? তিনি পাঁপড় ভেজে নিয়ে এলেন। তারপর বাড়ি আসতে কল্যাণী স্নান করিয়েদিলে। দুপুরের পর বার হয়ে বেড়িয়ে এলুম, বিভূতি ওর ভ্রমণের প্রবন্ধ শোনালে। ১৯৩৯সালের এই দিনটি আর আজকের দিনে কত তফাত তাই ভাবি। জীবনের কি বিচিত্র গতি!

সন্ধ্যায় মায়াদিদি, কল্যাণী ও আমিখুকুদের বাড়ি গেলুম।খুকু, কল্যাণী, মায়াদিদি গানগাইলে, গল্প ও চা খাওয়া [খাওয়া] হল। রাতে কল্যাণী কেবল গান করে আর আমার কথারনকল করে—ঘুমুতে দেয় না। একটা বাঙলা গান গায়, 'মচ্ছ বাজার ভার' বেশ লাগে ওর মুখে।

২রা জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৮ই পৌষ, ১৩৪৭ বৃহস্পতিবার

সকালে লোকাল ট্রেনে কলকাতা। স্কুল থেকে সজনী দাস ও পশুপতিবাবুর বাড়ি। জ্যোৎস্না এসে ওর ছবি দেখালে। অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করলে। ওখান থেকে বাসে বারবেলাতে এলুম। অনেক নতুন বিষয়ে আলোচনা হল। আমি ও উকিলবাবু অনেকরাত্রে বাড়িফিরি।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৯শে পৌষ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে বহুলোক। কানাই সাহা এসে প্রুফ দেখলে ভ্রমণকাহিনীর। সকালে ছুটি হল। প্রথমে রমাপ্রসন্নদের আপিসে যাই, গৌরবাবু চা খাওয়ালে। হেঁটে আসবার পথে ফিয়ারলেনেরদেবুদের বাড়ি গিয়ে বসে গল্প করি। তারপর M.C.-তে এসে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। মিত্র ও ঘোষে কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে বইয়ের নামকরণ নিয়ে কথাবার্তা। 'অভিযাত্রিক' নাম ঠিক করা গেল। অমর দত্তের সঙ্গে দেখা পথে—বাসায় এল গল্প করতেকরতে।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪১। ২০শে পৌষ, ১৩৪৭শনিবার

সকালে এল কানাই সাহা। ভ্রমণকাহিনীর proof দেখা হল। তারপর স্কুলে গেলুম।কল্যাণীর পত্র পাই, সে লিখেছে বনগাঁ যেতে। ২টোর ট্রেনে বনগাঁ আসি। কল্যাণীকে নিয়েখুকুদের বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ গল্প করি। গান করলে কল্যাণী।খুকুরবিয়ের পরে সে সব দিনেরকথা মনে হয়—কি ওলটপালট হয়ে গেল জীবনের তাই ভাবি। পরিবর্তনই জীবন।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২১শে পৌষ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করলুম ১০টা পর্যন্ত। তারপর খুকুর বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ গল্প করি। দুপুরে লিখছি, খুকুএল এবাড়ি। তাকে পৌঁছে দিতে বল্লে—তখন বিভূতি এল। কল্যাণীকেসঙ্গে নিয়ে রাজনগরের বটতলা পর্যন্ত

বেড়িয়ে এলুম [—] বিভূতি ছিল সঙ্গে। শুকনো পাতায়আগুন ধরিয়ে দিই। রাত্রে মন্মথদার আড্ডায় গিয়ে গল্প। কল্যাণী ছাড়তে চায় না—তবুও সেতো ঘুমিয়ে পড়েচে।

পাটিসাপটা খেয়ে রাত্রে জাহ্নবীর সংসার মনে পড়ল। আটবছরের সংসার—শেষ হয়েগিয়েছে আর বছর। পরিবর্তন—জীবনের কি পরিবর্তন!

৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২২শে পৌষ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে ওদের ঘরে এলার্ম বেজে উঠল। তখন পাঁচটা। কল্যাণী উঠে জিনিসপত্র গুছিয়েদিলে ও মায়াদি ও আমি কলকাতা এলুম। গুটকে এল স্টেশনে। মায়াদিদিকে হোস্টেলে রেখেট্রামে স্কুল। তারপর প্রেমরঞ্জনবাবুর বাড়ি এসে প্রদোষের সঙ্গে গল্প করি। সুপ্রভা যেন বাড়ির মালিক, আমি ওর বাসাতে ওর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে অনুরোধ করতে এসেচি। স্কুল থেকে প্রবাসী হয়ে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি। বালক কবি এল সেখানে, ১৯শে অভিনন্দন হবে তাই বলতে।

রাত্রে বহুলোক। প্রসাদ (পানিতর) [,] গৌরীশঙ্কর, তারাপদ, অবিনাশবাবু (ইন্‌সিওর)ও সর্বশেষে ক্ষিতিনাথবাবু (যশোহর)।

প্রসাদকে বিয়ের গল্প করলুম।

৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৩শে পৌষ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে গোপালবাবু (মাতৃভূমি) এসে গল্প করলেন ও লেখা নিয়ে গেলেন। মিতেররাঁচীভ্রমণও ওই সঙ্গে দিলুম। স্কুল হেডমাস্টারের সঙ্গে ছুটির পরে বরুণ মিত্র (মায়া) বলে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম ওয়েলেসলি স্ট্রীটে। দুপুরে প্রদোষের বাবা প্রেমরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলুম। ওখান থেকে হেঁটে মিত্র ও ঘোষে কপি দিলুম ভ্রমণকাহিনীর। চা খাচ্চি এমন সময় অপূর্ববাবু এসে বল্লেন—চলুন আমাদের ওখানে। M.C.-তেগিয়ে বাসায় ফিরি। তারপর ইস্টবেঙ্গল স্টোরে গিয়ে কল্যাণীর জন্যে ঢাকাই শাড়ি একখানাকিনি।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৪শে পৌষ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে এল বিশ্বনাথ। লিখতে দেরী হয়ে গেল। যখন স্নান করচি, তখন প্রায় ১১টা। উঠেস্কুলে গেলুম। জিনিস নিয়েই এসেছিলুম—বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ। সন্ধ্যায় চমৎকার জ্যোৎস্নাউঠল। কল্যাণী অনেক গান করলে কত রাত পর্যন্ত। বিছানায় জ্যোৎস্না পড়েছিল—বেশ লাগল গানগুলো। রাত ২টায় বোধহয় ঘুমুলাম।

‘[?] ভুল ভুলরে’ বলে একটা গান আমার এত ভাল লাগল!

৯ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৫শে পৌষ, ১৩৪৭ বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর খুকুর বাড়ি গিয়ে শুনিখুকুবড়ি দিচ্চে—এসে বল্লে—একটু ব্যস্ত আছি। আমি বেরিয়ে মন্মথদা ও বিভূতি মুখুজ্যের বাড়ি গেলুম। দুপুরে খেয়ে শুয়েচি—এমন সময় এলেন পশুপতিবাবু ও যূথিকা। ওঁদের নিয়েবসলুম, তারপর খুকুদের বাড়ি নিয়ে গেলাম। কল্যাণীকে নিয়ে সবাই মিলে বারাকপুর গেলাম।কল্যাণীকে সব বাড়িতে ঘোরালেন ওঁরা—নারাণদের বাড়ি, সইমা কল্যাণীকে দেখে চোখেরজল ফেললে। আমরা ফিরবার পথে বিলবিলের মধ্যে দিয়ে বকুলতলা দেখিয়ে আমাদের বাড়ি এলুম। আমি আবার ইতিমধ্যে একা বাঁশবনের দিকে বেড়াতে গেলুম। নিস্তব্ধ বনভূমি, এড়াঞ্চিফুলের শোভা এত ভাল লাগল। কল্যাণী আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়ায় ফুল দিলে, প্রণাম করলে। ন’দিদের সঙ্গে দেখা করে সবাই মিলে ইন্দু রায়দের মাঠে এসে দাঁড়াই।বারাকপুর থেকে ফিরবার পথে বাঁওড়ের ধার দিয়ে ফিরলুম। খুকুকে তুলে নিয়ে আসাগেল—আমি হেঁটে এলুম। ওদের গান হল।খুকু, কল্যাণী—সকলের। সন্ধ্যার সময় চলে গেল। আমরা বসে আড্ডা দিই—তারপর খুকুকে পৌঁছে দিয়ে মন্মথদার ওখানে গেলুম।

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ মারা গিয়েচেন—আজকের খবর। কাল একটা সভা এজন্যে, তাইসকলে বীরেশ্বরবাবুর ও মুন্সেফবাবুর কাছে গিয়েছিলুম।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৬শে পৌষ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে বেলা দশটা পর্যন্ত লিখি। তারপর মিটিং-এর জন্যে নানাস্থানে ঘুরি, আলো যোগাড় করি প্রফুল্লের বাড়ি। খুকুর ওখানে খেলুম। এখনো ওদের ছাদের চিলেকোঠার গায়ে দিব্যি রোদ ভাল লাগে—ও বল্লে রেলিং ধরে বাইরে এসে রোদটা লক্ষ্য করলে অনেকক্ষণ ধরে। আমি বিভূতির ওখান থেকে বাড়ি এলুম চলে। কল্যাণী স্নান করিয়ে দিলে, তারপর আমি একটু বিশ্রাম করলুম। আবার বিকেলে প্রফুল্ল ও মন্মথদার বাড়ি যাই। তারপর ফিরে এলেকল্যাণী সাজগোজ করিয়ে দিলে—সভায় গিয়ে দেখি সভা বসতে দেরী।খুকুর বাড়ি গিয়ে অল্পএকটু বসি। ও আশা করেছিল কল্যাণীকে নিয়ে আমি যাব বিকেলে। পান চাইলাম—খুড়িমাবল্লে—তুই যা। ও কিছুতেই উঠল না—খুড়িমাকে পাঠালে। এ কি রকম ব্যবহার ওর?

সভাতে মুন্সেফবাবু প্রবন্ধ পড়লেন। আমি, প্রফুল্ল বক্তৃতা দিলাম। এসে কল্যাণীর সঙ্গেগল্প করলুম অনেকক্ষণ। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৭শে পৌষ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে লিখে সকলেই বার হই। খুকুদের বাড়ী গেলুম। চশমা পকেট থেকে বার করে পরা অভ্যেস ঠিক আমার আগের মতই আছে। খুকুস্নান করতে ব্যস্ত—দেখা হোল না। আমিঅন্য কোথাও বসে গল্প করে এলুম। কল্যাণীরা দুপুরে বেড়াতে গেল—আমি মন্মথদার বাড়ীবসে গল্প করি। সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথ এসে ডেকে নিয়ে গেল—মুন্সেফবাবুর অভিনন্দনপত্রলেখা হোল। রাত্রে অপূর্ব জ্যোৎস্না।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৮শে পৌষ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে মুন্সেফবাবুর অভিনন্দন লিখি—মনোজ বসু এল। সঙ্গে করে গেলুম মুন্সেফবাবুর বাড়ী। সেখানে থেকে খুকুদের বাড়ী গিয়ে দেবু, সুরেশের স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করে বাড়ী ফিরলুম। কল্যাণী স্নান করিয়ে দিলে। তারপর স্কুলে হেড পণ্ডিত মশায়ের অভিনন্দন সভায় গেলুম। খগেনদা, সৌরীন, হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা। সভায় আমি বক্তৃতা করলুম। তারপর খুকু, দেবু, কল্যাণী, সুরেশবাবুর স্ত্রী ও আমি সবাই মিলে রাজনগরেরবটতলায় বেড়াতে গেলুম। সেখানে বটগাছের তলায় আধ আলো (?), আধ অন্ধকারে বসেআমরা কতক্ষণ কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি করলুম। ওখান থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্না উঠলো।কল্যাণীকে খুকুদের বাড়ী রেখে আমি মুন্সেফবাবুর পার্টিতে এলুম। সেখানে খুকুও দেবু এসেডাকলো। বটতলা থেকে বার হবার সময় খুকুবল্লে—চলুন, আমরা আলাদা যাই। ওকে দেখলেকষ্ট হয়—যেন একটুখানি মিষ্টি কথার কাঙাল হয়ে পড়েচে। আবার কবে মানকুণ্ডু যাবেন, বারবার জিগ্যেস করলে।

রাত্রে কল্যাণীকে বকলুম। ও ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদতে লাগল। ছেলেমানুষ, বকুনিখেলেই কাঁদে। ভারী মায়া হয়।

যখন কাছারীর ঘণ্টা পড়লো alarm bell—তখন যেন মনে হোল জাহ্নবীর বাসায়শীতের রাত্রে শুয়ে আছি। ওর কথা মনে হোল, পুরোনো বাসায় পুরোনো দিনগুলোর কথামনে হোল—মন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। জাহ্নবী নবদ্বীপে গিয়েছিল, ভাতের হাঁড়িদেখিয়েছিল—জ্ঞান মাছ খেলে, সে সব কথা মনে হোল।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৯শে পৌষ, ১৩৪৭।সোমবার

কল্যাণী আজ যেতে দিলে না—পৌষ সংক্রান্তি। কাল সকলে অফিসার ও মুন্সেফের বিদায়ের জন্য বলেছিল থাকতে। আজ সকালে কল্যাণীকে নিয়ে খুকুদের বাড়ী যাই। তারপর স্নান সেরে বেলা একটার সময় আবার ওদের ওখানে গিয়ে কল্যাণী, নীলিমা, দেবুদের নিয়ে সাতভেয়েতলা এসেছিলুম। ও সেকথা কতবার করে বল্লে। পুলের তলাকার পথ দিয়ে যেতে যেতে বার বার বল্লে—চলুন যাই, সেবার যাওয়া যতটা হয়েছিল, তা ছাড়িয়ে যাই। যেতেযেতে বল্লুম—রামপদ কই খুকু? রামপদ আজ কোথায়? ও বল্লে—রামপদ আজ নেই—কিন্তু আমরা দুজনে কাছাকাছি আছি—না? বল্লুম—ঠিক। সেই পুলের তলা দিয়ে গেলুম সেবার যতটাগিয়েছিলুম—তার চেয়েও। এবার আর একটি নতুন মেয়ে এসেচে—কল্যাণী। সত্যি ও আমাকে বড় ভালবাসে, আজ আমার কি ভাগ্য যে এই সাতভেয়েতলায় বেড়াতে এসেচি—কল্যাণীওসঙ্গে আছে। এমন যে হবে কখনো ভেবেছিলুম? কল্যাণী হাসিতে গানে সমস্ত সময় ভরিয়েরেখেচে। ওর কথায় সবাই খুশি। খুকুনৌকায় উঠে আসবার সময় বল্লে—তাস খেলবো। তাসখেলা হোল, খুকুর খুব উৎসাহ—কি উৎসাহ তাস খেলায়। পূর্ণচন্দ্র উঠচে ওপারের গাছপালারআড়াল থেকে (—) কল্যাণী, দেবু সবাই দেখলে। আমি এসে মুন্সেফবাবুর পার্টিতে গেলুম।মিটিং শেষ— S.D.O. বসে আর মুন্সে বসে। খানিকটা আড্ডা দিয়ে এসে দেখি কল্যাণী রান্নাকরচে। বেশ রাঁধতে পারে। এসে বসলুম ওর কাছে। দেবু খুকু (,) নীলিমা এল। নিমন্ত্রণ ছিলএখানে। খুকু বলে—গল্প বলুন। তিনটে গল্প বলি। অনেক রাত্রে ওরা খেয়ে চলে গেল।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ১লা মাঘ, ১৩৪৭।মঙ্গলবার

কল্যাণীকে ডাকলুম তখন রাত প্রায় ৪॥০টা। ও বল্লে—এখনও জ্যোৎস্না আছে। ও যেতেদিলে না। দুজনে খুকুর বাড়ী গেলুম। সকলে বসে গল্প করা গেল। কল্যাণীকে নিয়ে ফিরে এলুম। দুপুরে কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়লো। আমি বার হয়ে গল্প করি মন্মথদার বাড়ী। খয়রামারিগেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কেবলই এই ছন্নছাড়া সন্ধ্যায় জাহ্নবীর কথা মনে আসে। এতদিন পরে যেন ওর কাছে পুরোনো বাসাটায় গিয়েছি। ও বল্লে—আসুন দাদা। যেন কেঁদে উঠলো—এত দিন যেন ঝগড়া হয়েছিল। আমি যেন ময়দা কিনতে যাচ্চি সন্ধ্যাবেলা। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে সেই আগের মত ভালবাসেন? আহা, কোথায় চলে গেল! কল্যাণীকে নিয়ে খুকুদের সঙ্গে তাস খেললুম। কল্যাণী ও আমি কত গল্প করি। একদিন ও আমার কাপড়ের সঙ্গে গিঁট দিয়ে রেখেছিল, পাছে আমি পালাই। বড় ভাল লাগে ওকে। রাত্রে কল্যাণী বড় হাসায়।বলে—ঘুমুবেন না।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২রা মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

শেষ রাতে আমি কল্যাণীকে উঠিয়ে বলি—ওঠ, জিনিসপত্র গোছাতে হবে। ও শীত বলেউঠলো না। বড় ভূতের ভয় আর শীতকাতুরে। তারপর ভোরের ট্রেনে চলে এলুম। এসে নুটুপ্রভৃতির পত্র পেলুম। স্কুলে গেলে শরৎস্মৃতি সমিতির লোক আমাকে সভাপতিত্ব করতেঅনুরোধ করলে। তারপর প্রবাসী অফিসে টাকা নিয়ে গিরিনের ওখানে। গিরিন নেই। রমেশবাবুর ওখানে এলুম, রমেশও নেই। মিত্র ও ঘোষে এলুম চা খেতে। M. C. হয়ে মেস।

কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে। ওকে ফেলে এসে মোটে ভাল লাগছে না। ও কেমন হাসায় কথা বলে (—) সর্বদা সে কথা মনে পড়ছে। বেশ আনন্দ গিয়েচে ক'দিন।

কল্যাণী সেদিন বেশ বলেছিল—আপনার লেপখানা আপনি গায়ে দিন—আমার লেপনেবেন না! বাবা তো দু'খানা লেপ দিয়েচেন।

অথচ সেদিন শীত নেই। আমার লেপের দরকার নেই। কল্যাণী একথা এমন হাসির সুরেবল্লে যে, আমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ি। কি চমৎকার হাসাতে পারে! এজন্যে বড় ভাল লাগে ওকে। এমন মজার কথা এক-একটা বলে!

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ৩রা মাঘ, ১৩৪৭।বৃহস্পতিবার

সকালে কানাই সাহা এসে বক্‌বক্‌ করে সময় খানিকটা নষ্ট করে গেল। কল্যাণীকে পত্র।ধীরেসুস্থে লিখতে পারলুম না, স্কুলের বেলা হয়ে গেল। স্কুলে এল শরৎস্মৃতি সমিতির লোক। ওখান থেকে বার হয়ে সজনী দাসের ওখানে গেলুম। পশুপতিবাবু সেদিন বারাকপুর যাওয়ার ফন্দি (?) করেচেন। কল্যাণীর কথা খুব বলেচেন শুনলুম। ওখান থেকে মায়াদিদির হোস্টেলেএসে দেখা পেলুম না। হেঁটে D.M.Library-তে এসে খানিকটা বসে চা খেয়ে বারবেলা ক্লাবেএলুম। বালক কবি এসেচে রবিবার আমায় অভিনন্দনের সভাপতি ঠিক করতে। আমি সুরেন মৈত্রকে ফোন করতে উমা ফোন ধরলে—প্রথমে ইংরিজিতে কথা বল্লে—তারপর আমার নামকরতে বাংলায় বলতে লাগলো। সভাপতি নির্বাচন এখনো করেনি—নীরদবাবুকেও ফোন করলুম। নীরদবাবু কল্যাণীকে নিয়ে আসতে বল্লে ও রবিবারে। অনেকরাত্রে চলে আসি।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ৪ঠা মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

আজ সকালে ঘুম ভেঙে কল্যাণীর কথা মনে হয়েচে। আর কিছুক্ষণ পরে বনগাঁয়ে ও চিঠি পাবে এখন। রমাপ্রসন্ন, অপূর্ব বাগচী ? সেই ছেলেটি এল সকালে। সকালে স্কুল ছুটি হতেইগেলম Bank-এ। সেখান থেকে খাতা নিয়ে M.C.-তে। সেখান থেকে বাসা। তারপরবুদ্ধদেববাবুর বাড়ী। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সভায় যাচ্চে শুনে এলুম। হীরু এল সেখানে।

গোপালবাবুর মুখে শুনলুম সুপ্রভা? থেকে পত্র দিয়েচে। প্রীতিদি এসেচেন কলকাতায়—তার হাতে ওর উপন্যাসের কপি পাঠিয়েচে।

বারবেলা থেকে শিবু ও আমি হেঁটে বাড়ী চলে আসি।

কল্যাণীকে কলকাতায় আনার জন্যে নীরদবাবু বল্লে—আগামী রবিবারে। কিন্তু সেদিন আমি বিশ্বাসচকে অভিনন্দন নিচ্চি।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ৫ই মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার।

স্কুলে যাবার সময় মনে হোল আজ সকালে বেরিয়েচি। সুতরাং ডাক্তার অমল চৌধুরীরবাড়ীতে রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি শয্যাগত—আমায়দেখে খুশি হলেন। সেখানে গিয়ে দেখি সেবার রাঁচী থেকে ফিরবার পথে যে সন্ন্যাসী মত ছোকরাকে দেখি—সেই ছোকরাই শরৎবাবুর ছেলে। ছেলেটা খোঁড়া হয়েছে বাতে—অমনসুন্দর চেহারা !...স্কুল থেকে গেলুম ট্রেনে রাজপুর। ফুলিদের বাড়ী যাবার পথে বাঁশবনেরছায়ায় ছায়ায় কেবলই কল্যাণীর গানের সুরটি ‘চোখে মুখে লাগে যদি রে, ওরে মোদেরভাই—নাম দোষ নাই—কাটি সামালো’ কানে বাজছিল। ওর কি সব ছেলেমানুষি কাণ্ড ! আজ শনিবার বৈকাল, এত মন খারাপ হয়েছে এর জন্যে, কিছু ভাল লাগচে না কেন?

ফুলির মা রাগ করে চলেচে। ফুলি চা করে দিলে। কল্যাণীর কথা অনেক বললুম।বিকেলে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে দাঁড়াই। কেবলই কল্যাণীর কথা বলি এই ইচ্ছে হয়। ভগবানকল্যাণীর মঙ্গল করুন।

সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা। গৌরীশঙ্কর এসে ওর লেখা গল্প শোনালে।

ভাল কথা, ওবেলা স্কুলে যাবার পথে হরনাথের সঙ্গে দেখা। সে আমায় অনেক দূরএগিয়ে দিয়ে এল। কানুমামাও এসেছিল ওবেলা। জ্যোতিমামার যে সব কীর্তি কানু বল্লে তাতে জ্যোতিমামার ওপর অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। ছিঃ, এমন নীচু মনের মানুষ?

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৬ই মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে উঠে এক পাতা লিখতেই বালক কবির বড় ছেলে এসে বল্লে—চলুন, স্টেশনেসবাই এসেচেন। ওকে নিয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়ী গেলুম। সে যেতে পারবে না বল্লে। রানী বল্লে—কাকু, আসেননি কেন আপনি? তাড়াতাড়ি স্টেশনে এসে দেখি শৈলজা, প্রভাবতী, বুদ্ধদেব? সবাই দাঁড়িয়ে। ট্রেন ছাড়লো। দক্ষিণ বারাসাত পৌঁছে সবাই সালতিতে উঠেচলচি—প্রত্যেক গ্রামেই চিতা জ্বলচে! কি ব্যাপার? মনে খটকা লাগলো। লোকে বল্লে এ অঞ্চলে কলেরার মড়ক লেগেচে। বড় ভয় হোল, কেন এরা আমাদের এখানে আনলে? নিজের জন্যনয়, সেই একটি নিরীহা বালিকা—তার মুখ মনে পড়লো। কল্যাণী! তুই কি বুঝবি কি যেন হয়ে গেল এক মুহূর্তে। মনে হোল ওকে একবার দেখবো। প্রভাবতী ও তার ভাইঝি পূরবী পর্যন্ত ভয়পেয়ে গেচে দেখলুম। যা হোক, গ্রামে পৌঁছে গেলুম, সভা হোল। খুব খাওয়ালে। সেই ভীষণকলেরার মড়ক যে গ্রামে হচ্চে, সেখানে খেতে হোল চক্ষুলজ্জায় পড়ে। কাপুরুষতা দেখাবো কি করে? মরি মরবো। অভিনন্দনের পরে রাত্রে হেঁটে মাঠের মধ্যে দিয়ে রওনা সবাই মিলে—প্রায় ২৫/৩০ জন লোক। শৈলজাকে ডেকে চুপি চুপি বল্লুম—ভাই, আমার স্ত্রীর জন্যে বড় মনকেমন করচে। ও বল্লে—কেন ? বল্লুম—তা কি জানি! চিতা জ্বলতে দেখে পর্যন্ত এমনি মনেরঅবস্থা হয়েচে। ও হাসলে, সান্ত্বনা দিলে। আমার মন যে কি উতলা হোল কি বলবো! সেইদিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অন্ধকারে দূরের একটি নিরীহা প্রেমময়ীর কণ্ঠস্বর কেবলই কানেআসে, কান্না পায় যেন। কল্যাণী ! আর কি তোকে দেখতে পাবো? কেন এমন মনে হোল ? মেসে এসেই আগে ঘর খুলে দেখচি দোরের পাশে ওর চিঠি এসে পড়ে আছে কিনা। আছে, আছে! ভগবান তোমায় অজস্র ধন্যবাদ। সত্যিই এমন অদ্ভুত মনের অবস্থা আমার কেন হলআজ? চিঠিখানাও ওর আজ বড় সুন্দর। কতবার পড়লুম যে! তোকে ক্রমে ক্রমে চিনচি, কল্যাণী। কত ভাগ্যে তোর মত স্ত্রী পাওয়া যায়। হৃদয় আছে তোর। ভগবানকে আবার ধন্যবাদদিই যে ওকে পেয়েচি।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৭ই মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে বিশ্বনাথ এল। কল্যাণীকে পত্র লিখলুম সকলের আগে, কারণ সারারাত স্বপ্নেরমধ্যেও ওর কথাই মনে এসেচে। তারপর স্কুলে গেলুম—ছেলেদের নিয়ে Zooতে গেলুম।কারণ Zoo আজ সকলের জন্যে বিনি পয়সায় খোলা। জলের ধারে একটা গাছে বাদুড় ঝুলচে, উল্লুক গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে খেলা করচে—ঠিক যেন আফ্রিকা—কল্যাণীর চিঠিখানা জলের ধারে বসে দু'বার পড়লুম। তারপর ছেলেরা ছুটে ছুটে এসে কাছে বসতে লাগলো—বাওবাব গাছ দেখলুম এই প্রথম। কলকাতায় বাওবাব দেখবো, কখনো ভাবিনি, রাঁচির সেই bottle tree। আমাদের দেশের রাস্তায় যে বিলিতি চা—এর নাম Eretolobium Saman—Rain tree—আমেরিকাই ওর জন্মস্থান। ট্রামে আসতে আবদুলরসিদের সঙ্গে দেখা। তারপর শ্যামাচরণদা আজ স্কুলে এসেছিল ওবেলা (—) তার সঙ্গেনীরদবাবুর ওখানে দেখা করার কথা, কিন্তু ওদের পুরোনো বাসা দেখলুম বদলেচে।সুনীতিবাবুর বাড়ী গিয়ে চা খেয়ে কল্যাণীর কথা বল্লুম। অনেকদিন পরে ইনস্টিটিউটের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি 9/1 Dover Lane এ বাড়ী করেচেন। ফার্ন রোডে নীরদবাবুকে খুঁজে না পেয়ে ট্রেনে কলকাতা ফিরলুম।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৮ই মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে রমাপ্রসন্ন এল। ৮টার সময় ভাবলুম এই সময় কল্যাণী নিশ্চয়ই চিঠি পেয়েচে।স্কুল থেকে গেলুম সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে বিভূতিদের বাড়ী। সবাই বলে—আপনি বিয়ে করলেন আমাদের খাওয়ালেন না? ঘণ্টু এল। ওখান থেকে—?, হেডপণ্ডিত, ? অমরেশ সবাইমিলে কুমারটুলিতে প্রতিমা বায়না দিতে গেলুম। সেই চায়ের দোকানে খেতে বসে খোলারচালের দিকে চেয়ে মনে পড়লো অন্য বৎসরের কত কথা! সুপ্রভা—বিশেষ করে খুকুর সম্বন্ধে পাটনার মিটিং এর পরে কত কথাই ভেবেছিলুম। এবার কল্যাণী এসে সকল অভাব পূর্ণ করেচে। ওর চিঠিখানা পকেটেই ছিল—ছেলেদের সামনে বের করে পড়তে লজ্জা হোল। চা খেয়ে আমার ছেলেবেলাকার বাড়ীটার সামনে দিয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ী এলুম। বৌঠাকরুণ বসিয়ে চা ও খাবার খাওয়ালেন। বল্লেন—কল্যাণীকে আনলেন না কেন? পশুপতিবাবু বল্লেন—যূথিকা দেবীখুকুর চেয়ে কল্যাণীর বেশী প্রশংসা করেছেন। উনি নিজেও কল্যাণীর

খুবপ্রশংসা করলেন। উনি বল্লেন, খুকুর চেয়ে কল্যাণীকে ভাল লাগলো (।) কল্যাণী সরলাস্নেহময়ী।খুকুর সারল্য কম। একটু খেলোয়াড় ধরনের। আমি কল্যাণীর চিঠিখানা দেখালুমনা —কারণ কল্যাণী হয়তো কি মনে করতে পারে। ওখান থেকে বার হয়ে বাসে M.C. হয়ে মেসে আসতেই অবিনাশ ও কম্বল এল। নুটুর পত্রও পেলুম আজ।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৯ই মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে গোপালবাবু ও রমাপ্রসন্ন। কল্যাণীর পত্র পেয়ে সে বড় ব্যস্ত হয়েচে জেনে ১১টার ট্রেনে বনগাঁ। সে হাসতে হাসতে এল। কত খুশি আমায় দেখে। সন্ধ্যাবেলা সত্যর বাড়ীগিয়ে চা ও খাবার খাই। চারু দত্তের বাড়ী। জাহ্নবীকে একবার চারুদার মা এই বাড়ীতে থাকতেবলেছিল। তারকের বউয়ের সঙ্গে দেখা হল। তারপর লিচুতলা হয়ে বাসা। কল্যাণী সারারাতগান করলে-শেষরাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়লো—তাও আমার হাতখানা ধরে রাখলে পাছেপালিয়ে যাই ভোরের ট্রেনে।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১০ই মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

আসতে পারলুম না কল্যাণীর ব্যাপার দেখে। কিন্তু না এসে ভালই করেচি। বেলা দশটারসময় হঠাৎ জ্বর হোল। বাসায় এসে রৌদ্রে শুয়ে থাকি। কল্যাণী মাথা ধুইয়ে দিলে—বড্ড খুশিজ্বর হয়েচে—কারণ যাওয়া হবে না। দুপুরে ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় ? মন্মথদাদের বাসায়। রাত্রেবেশীক্ষণ জাগিনি।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১১ই মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

আজ সকালে জ্বর চলে গেল। সকালে সবাই মিলে পাহারা দিয়ে রাখলে ছেলেমেয়েরা—পাছে বার হই। কল্যাণী বড় ভালোবাসে—ছেলেমানুষ! তাও দুপুরে বিভূতির দোকানে গিয়ে বসেছিলুম। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে চলে আসবো—কল্যাণীর কি কাণ্ড! কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে। ছেলেমানুষকে কি করে যে বোঝাই। চলে আসতেই হোল মিটিং-এর জন্যে। জ্বরও যদি আসতো—তবে ঠিক থাকতুম। রাত্রের ট্রেনে এলুম। স্টেশনে হরিবোলের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে—বন্ধু কলকাতায় আছে।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১২ই মাঘ, ১৩৪৭। শনিবারসকালে কানাই সাহা এল। স্কুল থেকে বাসায় আসতেই মিটিং এর ? গাড়ী নিয়ে এল।সেখানে গিয়ে ভীষণ বৃষ্টি। ঠাণ্ডা লাগলো খুব। ভয় হোল আবার বুঝি জ্বর দেখা দেয়। রাত১০টায় আমি ও রমাপ্রসন্ন ফিরলুম।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১।১৩ই মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে নীরদবাবুর বাড়ী বালিগঞ্জে গেলুম। এটা নতুন বাসা ওদের। কত জায়গায় যে গেলুম ওদের সঙ্গে! বেলুড়, দমদমা, পার্ক সার্কাস কলকাতার সব দিক হয়ে গেল। ওখানথেকে বেরুবার সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। নীরদবাবুর মোটরে ঝাউতলা রোডের মোড়েনেমে বাসে মণি বোসের বাড়ী আসবো—দেখি বাসে ভূপতি চৌধুরী। সে বল্লে—আপনাদেরফটো বেশ উঠেচে। চলুন দেখাবো মণির বাড়ী। ঘণ্টাখানেক থেকে বাড়ী এলুম চলে। খেয়ে একটু বিশ্রাম করে কল্যাণীকে পত্র লিখি। তারপর ফুলুর (?) মার-বাড়ী গিয়ে খানিকটা বসে অপূর্ব বাগচীর বাড়ী গেলুম। সেখানে বহুক্ষণ মুকুলের কথা শুনলুম অপূর্ববাবুর মুখে। মুকুল মেয়েটা বড় কষ্ট পাবে দেখচি। ওখান থেকে বার হয়ে রমেশ সেনের দোকানে গিয়ে দেখি রমাপ্রসন্ন বসে। দুজনে চলে এলুম College Square-এ। সেখানে তণ্ডুলাল মাড়োয়ারী খুবতর্ক চালিয়েছে ধর্মসংক্রান্ত। আজ ২০ বছর ধরে এদৃশ্য দেখে আসচি। দুজনে অনেক দিন পরেফেভারিট কেবিনে চা খেলুম। Y.M.C.A.র সেক্রেটারী চক্রবর্তী ঠিক আগের মত এসে আমারসঙ্গে মিটিং এর আলাপ করলে। তারপর রমাপ্রসন্নের সঙ্গে দোকানে এলুম। ভাল কথা, আজবঙ্কিম এসেছিল মেসে বিকেলে।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৪ই মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে বাক্স গোছাতে গিয়ে দেখি বাবার হাতের খাতা ও পথের পাঁচালীর MS উইয়ে খেয়ে ফেলেচে—দেখে বড় দুঃখ হোল। স্কুল। সেখান থেকে বিভূতিদের বাড়ী। সেখানে আমারশ্বশুরের এক আত্মীয় সুরেশবাবুর সঙ্গে দেখা। ওখানে হিরণ্ময়ীকে বসিয়ে গেলুম ট্রামে সজনীর বাড়ী। সজনী বল্লে, শনিবারে শৈবাল গুপ্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ (—) যেতেই হবে মিসেস গুপ্তবলেছেন। আমি বল্লুম (,) তা সম্ভব নয়। ওখান থেকে ফিরচি, শৈলজার সঙ্গে দেখা। সে ডেকেনিয়ে চা খাওয়ালে। তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে (হাসপাতালে) বড় ভুগচে। দুজনে বার হয়ে এলুমকলেজ স্ট্রীট। ওখানে Prof. মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় বলতে বলতেচললেন স্যার যদুনাথ সরকার অতি খারাপ লোক (,) রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর রিসার্চ সত্যি আর সব মিথ্যে ইত্যাদি। তাঁর হাত অতি কষ্টে এড়ালুম যদি, তখনি কোথা থেকে এলেন মিঃচক্রবর্তী Y.M.C.A.র সেক্রেটারী। বল্লেন—চলুন মিটিং এ যাবেন না? আমি বল্লুম—বড় ব্যস্ত। (—) মিটিং মাথায় থাক। বাড়ি গিয়ে লিখতে হবে। ওঁদের হাত ছাড়িয়ে চলে এলুম মেসে। ননকু এসে বল্লে (—) Baptist Missionএ সোমবারে আমাকে Chief Guest হোতে হবে।আমি সোমবার কোথায় থাকি ঠিক নেই, রাজি হলুম না। সুরেনের কাছে গল্প করে এলুম।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৫ই মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে লিখি। বিশ্বনাথ এল। কল্যাণীর পত্র এল না কেন? স্কুল থেকে বাড়ী চলেএলুম—খুব বৃষ্টি এল। তারপর সুরেনের সঙ্গে দেখা করতে Midland Hotel-এ গেলুম। সেখানে চারু দত্ত বসে তার মায়ের অনেক নিন্দে করচে শুনে এলুম। বাসায় তারাপদবাবু এলরাত্রে।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৬ই মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে কল্যাণীর চিঠি এল না। বড় ভাবনা হোল। চিঠি না দিয়ে তো সে থাকে না? স্কুলথেকে প্রবাসী আপিসে—সেখানে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। বল্লে—কি বিভূতিবাবুচুপি চুপি বিয়েটা করে ফেললেন? কবে খাওয়াবেন বলুন! শ্যামাচরণদা এসেছিল স্কুলে। আমিটিফিনের সময় ছাদের ওপর ওকে বসিয়ে গল্প করলুম অনেকক্ষণ।

প্রবাসী আপিস থেকে মায়াদির হোস্টেলে গেলুম। কল্যাণী বলেছিল দেখা করতে। কানুমামা দেখি দাঁড়িয়ে আছে। মায়াদির সঙ্গে কথা বলে ট্রামে এলুম রমেশ সেনের ওখানে, চা খেয়েবেচু চাটুয্যের স্ট্রীট দিয়ে বাসায় এসে দেখি উকিল ভূপতি বসে। সে অনেক লেখা এনেচেআমায় দেখাতে। বসে বসে অনেক লেখা শুনতে হোল। কানুমামা বল্লে—সে যাবে না বনগাঁ, মায়াদিকে আমায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি সজনীরা যশোর ট্রেনে নিয়ে যায় আমায় (—) তবে বড় মুস্কিলে পড়বো দেখচি। কল্যাণীকে স্টেশনে আসতে লিখলে হ'ত কিন্তু।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৭ই মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে লিখি। আজও কল্যাণীর পত্র এল না কেন? শরীর অসুখ করেচে না তো? ভাবনায় পড়েছি ওকে নিয়ে। দেবু এল—বল্লে—কল্যাণী, খুকু, নীলিমা, সবাই মিলেদেবানন্দপুরে যাবার ঠিক করেচে। স্কুলে সকালে ছুটি হোতে ট্রামে চৌরঙ্গী পর্যন্ত গেলুম। বৃষ্টিহল—সঙ্গে সঙ্গে air raid-এর মহড়ার siren বেজে উঠলো। পুলিশ আর যেতে দেয় না।অগত্যা ব্রিস্টল হোটেলের গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন All clear signal দিলে তখন air warden-রা পথ ছেড়ে দিলে। ট্রাম থেকে এসে লিখি। তারপর বারবেলা ক্লাবে গেলুম।আজ অনেক লোক এসেচে। একজন কাশী-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে। রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে দেখি প্রবোধবাবু এসেচে।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৮ই মাঘ, ১৩৪৭।শুক্রবার

সকালে লিখি। Proof নিয়ে গেল অভিযাত্রিকের। স্কুলে গিয়ে সকালে ছুটি হোল। আমি গেলুম ভূপতির আপিসে। কল্যাণীর ফটো দিয়ে বাসায় এসেই স্টেশনে এলুম। মায়াদিবসেছিল মেসে, ওকে সঙ্গে করে নিয়েই এলুম। মেঘ দেখে ভাবলুম বৃষ্টি হবে—কিন্তু বনগাঁএসে তত মেঘ দেখা গেল না। কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হোল। ওপারে সাহিত্য বাসর। আমায় সভাপতি করে একটা Resolution করে নিয়ে নিল। অনেকরাত্তির পর্যন্তকল্যাণীর সঙ্গে গল্প।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ১৯শে মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে উঠে মন্মথদার বাড়ী বেড়াতে গেলুম। তারপর পাঁচী এসেচে আমাদের পুরোনো বাসায় (—) ওদের পুজো হচ্ছে। বাসায় ঢুকে জাহ্নবীর জন্যে কষ্ট হোল। পাঁচী প্রতিমা সাজাচ্চে। স্নান করতেই (?) আসতেই নীরদবাবুরা মোটরে এলেন। ওঁদের নিয়ে অঞ্জলি দেওয়াহোল। তারপর আমরা সবসুদ্ধ চলে গেলুম বারাকপুরে। হরিপদদা, ইন্দু রায়, গজেন এল আমাদের সঙ্গে। আমাদের বাড়ীতে বসে কল্যাণীর গল্প পড়া হোল। তারপর আমরাসরস্বতীপুজোর বিকেলে কুঠীর মাঠে গেলুম কতকাল পরে। সেই বাল্যদিনের জ্যাঠামশায়েরসঙ্গে এসেছিলুম প্রথম। কল্যাণী কুল পাড়তে লাগলো—মায়াদি বেড়ার মধ্যে গাছে কুল তুললে।আমরা বেলেডাঙায় বটতলা পর্যন্ত গিয়ে একটা জায়গায় ছায়ায় কতক্ষণ বসি। কল্যাণী ওমায়াদি গান গাইলে। সঙ্গে সত্য, গঙ্গাচরণের ছেলে, গুটকে, ইন্দু ছিল। ওখান থেকে বাঁওড়েরধারের পথ দিয়ে গোপালনগরে গেলুম স্কুলে। বটগাছগুলো কাটিয়ে ফেলেচে দেখে কষ্টহোলো। সুধীরবাবু সবাইকে চা (,) খাবার খাওয়ালে—তারপর আমরা পুকুরের ধারে মাঠেরমধ্যে বেড়াতে গিয়ে নীরদবাবু ও আমি কত আলোচনা করলুম। দিনটি বেশ কাটলো। শিমুল ফুলের শোভা হয়েচে পথে। পরেশ খুড়ো, ইন্দু, হরিপদদা সবাই ছিল। বনগাঁ এসে চা খেয়েচলে গেল।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২০শে মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

আমি সকালে উঠে যশোর গেলুম সাহিত্যসভায়। স্টেশনে নেমেই দেখি প্রবোধেন্দুবাবু ওশান্তি দাঁড়িয়ে। মোটর এসেছিল নিতে—ওদের সঙ্গে যেতে যেতে গেলুম টরুদের বাড়ী।জজসাহেবের বাড়ী থেকে সোজা সভায়। সভায় ক্ষিতিবাবু সভাপতি। আমি প্রথম বক্তৃতা করি।তারপর চাঁচড়া গেলুম সভার পরে। বাবার সঙ্গে প্রথম আমি যখন মাইনর দিতে আসি, জজসাহেবের বাড়ী গিয়ে প্রবোধেন্দু সংস্কৃত আলোচনা করতে লাগলো। আমরা স্নান করেনিয়ে খেতে গেলুম। ক্ষিতিবাবুও নিমন্ত্রিত। সবাই বসে গল্প করে খেলুম। তারপর সবাই বসে গল্প করে মোটরে স্টেশনে আসি। সারাপথ শিমুল গাছে ফুলে ভর্তি। ডাঃ সত্যনারায়ণ আমাদের ফটো তুললে। মন্মথদার বাড়ী এসে গল্প করে বাড়ী এলুম। কল্যাণী এসে গল্প করলে—তারপর ওরা চা খেতে গেল। আমি মনোজ ও বিভূতি সেদিনকার সভা সম্বন্ধে অনেককথা বল্লুম। মন্মথদার আড্ডা হয়ে বাড়ী চলে আসি। রাত্রে সকালেই শুয়ে পড়ি—কারণ শরীরখারাপ ছিল।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২১শে মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে উঠে আজ উৎকৃষ্ট পরোটা ভাজা খেলুম—কল্যাণী বল্লে, বেলে দিইচি। স্নানের পূর্বে বার হয়ে মন্মথদার বাড়ী ও আমাদের পুরোনো বাসায় গিয়ে বসি। পাঁচী চা করে নিয়ে এল। মনে হোল জাহ্নবী যেন এখনও রয়েছে। কল্যাণী স্নান করতে গেল গুটকে ও আমারসঙ্গে। তারপর দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে মন্মথদার বাড়ী বসে গল্প করি। এসে হালুয়া তৈরি করলুম নিজে—সবাই খেয়ে প্রশংসা করলে। যাবার সময় কল্যাণী কলকাতায় যাবার জন্যে বল্লে। ভাতখেতে খেতে ছুটে এসে আমার হাত ধরে বল্লে—বলুন আপনি রাগ করেননি? বেশ লাগলো।গুটকে চুরুট নিতে এলো মন্মথদার বাড়ী থেকে, ফিরে গিয়ে বল্লে—কাকীমা আপনাকে আসতেবলচে। সেখানেও যতা, মায়াদি বসে।

খানিকটা গল্প করতেই দুগগো ডাকতে এল। ননীদার মেয়ের বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রণ খাবার আগে মনোজ আমায় ডেকে লেখা শোনালে। কল্যাণীকাল বলে, আপনাকে ফেলে ঘাটশিলায় কি করে থাকবো?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২২শে মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

মায়াদিকে নিয়ে আসবো—কল্যাণী বারণ করেছিল—হয়তো থাকতুম, কিন্তু মায়াদিকেনিয়ে আসতেই হবে। মায়াদিকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে স্কুল। নরেন সিংহ (মাধবপুরের) স্কুলেএসে গল্প করলে। আমি বাসায় এলুম—আর কোথাও বেরুইনি। কল্যাণীর জন্যে মন আজ বড় খারাপ—কিছু ভাল লাগচে না। একবার ভাবলুম বিকেলের ট্রেনে বনগাঁ যাই। কিন্তু কালমাতৃভূমির লেখা তাহলে দেওয়া হয় না।

তারাপদ এসে হিমালয়ের গল্প শুরু করলে। আমিও জমে গেলুম। বল্লে—কত লোকে ভবঘুরে হয়ে গেল হিমালয়ের নেশায়। বাইরের টান বড় ভয়ানক—একবার যার লেগেচে তার আর থাকা চলে কি? দুর্দমনীয় বাইরের টান অসীম অনন্ত—আর বল্লে—টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখবার জন্যে কত লোকের ভিড়। পৃথিবীর মধ্যে ও দৃশ্য আর কোথাও নেই। আমেরিকানটুরিস্টরা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে আছে রাত সাড়ে তিনটার সময়। আমি বল্লুম—আলমোড়া থেকেগাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পথে আমি একবার যাবো। নিবিড় হিমারণ্য, বনকুসুমের শোভা সন্ন্যাসীর মত গৈরিক ধারণ করে আমার বন্ধুটি গিয়েছিল—আমিও যাবো।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৩শে মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে বিশ্বনাথ এল। তারপর স্কুলে গিয়েই ছুটি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চলে এলুম বরিশাল এক্সপ্রেস ধরতে। বেশ লাগলো সারা মাঠটা। কল্যাণীদের বাড়ী আসবার সময় মন্মথদাডাকলেন। সেখানে গিয়ে বসে গল্প করে চলে এলুম। কল্যাণী ও সুনীতিদি বসে কতক্ষণ গল্পকরলে। তারপর আমি একটু গেলুম মন্মথদার আড্ডায়। তখন রাত প্রায় ৯॥০টা।রাত্রে কল্যাণীরশরীর ভাল ছিল না—সে কথা মনে পড়লো। আমি রাত্রে কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৪শে মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে লিখি। মন্মথদার বাড়ী বেরিয়ে আসি। দুপুরে শুই, সুনীতিদি এসে গল্প করে।তারপর আবার বেড়াতে যাই। কল্যাণীর সঙ্গে তর্ক হোল সন্ধ্যাবেলা। ওকে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে বেড়িয়ে আসি ও মন্মথদার আড্ডায় ওকে নিয়ে বসি।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৫শে মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে উঠে মন্মথদার বাড়ী। দুপুরে কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলায় রওনা। কলকাতায়মেসে এসে ছেলেরা দেখা করতে এল ওর সঙ্গে। তারপর ওকে নিয়ে দুনুর (?) মার বাড়ীগিয়ে দেখি কেউ নেই। কলেজ স্কোয়ার ঘুরে এসে আমরা রওনা হই। ট্রেনে ভিড়ছিল—তারপরে ভিড় অনেক কমে গেল। রাত দুটোর সময়ে স্টেশনে নেমে ধানক্ষেতের পথদিয়ে বাসায় এলুম।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৬শে মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে উঠে কমলদের বাড়ী গেলুম কল্যাণীকে নিয়ে। তারপর শালবনে অনেকক্ষণবসলুম। বৈকালে ওদের সবাইকে নিয়ে ফুলডুংরী ও শালবনে বেড়াতে গেলুম। খুব জ্যোৎস্না, ফুলডুংরী উঠে আমরা অনেকক্ষণ বসে থাকি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১।২৭শে মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

এদিন সকালে কমল এল। তখন আমরা ঘুম থেকে উঠিনি—তারপর কল্যাণীকে নিয়েনদীর ধারে গেলুম বেড়াতে। ফিরে এসে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যায় কল্যাণীকেসুবর্ণরেখার ধারে নিয়ে গেলুম বেড়াতে। ডাকতে এল অমরবাবু বিবেকানন্দ স্মৃতি সভায়সভাপতিত্ব করবার জন্যে। আজ অপূর্ব জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ গিয়ে মাঠের মধ্যে বসে থাকি।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৮শে মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে কোথাও বেরুলাম না, বসে বসে লিখি। তারপর দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেড়াতেযাই। সন্ধ্যাবেলা কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখার মধ্যে পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। জ্যোৎস্নারাত্রে কতক্ষণ রইলুম বসে নদীর ধারে। শান্তিকে সিগারেট আনতে পাঠানো গেল—সে আর ফিরলোনা।আমি রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলুম।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৯শে মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ওপারে ঝর্ণার ধার ধরে অনেকদূর চলেযাই। একটা পাহাড়ের কাটাজঙ্গল পার হয়ে বনের মধ্যে পাথরের ওপর দুজনে বসলুম। তারপর তিনু ঝর্ণার ধারে অনেকক্ষণ বসে জল খেয়ে পাহাড়ে উঠলুম। ফিরতে হয়ে গেল বেলা ৩টা। পাহাড়ের ওপর কি সুন্দর গোলগোলি ফুলের শোভা। সন্ধ্যায় সূবর্ণ সংঘের অধিবেশনে আমরা সবাই গেলুম।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৭। শুক্রবার

ফাল্গুন দিনের অপূর্ব শোভা।

৭ই মার্চ, ১৯৪১। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪৭। শুক্রবার

এদিনটা ভালই কাটে।

১১ই এপ্রিল, ১৯৪১। ২৮শে চৈত্র, ১৩৪৭। শুক্রবার

আজ ছুটির দিনটা।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪১। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪৮। বৃহস্পতিবার

কাল বিকেলে বারাকপুরে এসেচি। যখন গাঁয়ে ঢুকি তখন বেশ ঝড় আরম্ভ হয়েছিল। পরে অবশ্যি থেমে গিয়েছিল। চালকীতে দিদিদের সঙ্গে দেখা করে এসেচি।

৯ মাস পরে বারাকপুরে এসে এত ভাল লাগচে বলবার নয়। বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম বার বার। মনে গর্ব হোল এর সমস্ত জিনিস আমার নিজের হাতে গোছানো। লোকে জানে এ বাড়ীর কী আমি। নিজের ওপর শ্রদ্ধার ভাব হয়। নতুন জিনিস এটা, এই অনুভূতি।

রকের ওপাশে বিলবিলের দিকে যে ঠেস-চেয়ার ওখানে বসে উনি রাতের খাবার খান, ঘি, মাখন, রুটি, আলুচচ্চড়ি, দুধ, গুড়! এত ভাল লাগচে বারাকপুর যে বলবার নয়। লিখবার নয়। সমস্ত দিন বড় খাটতে হয়েছে। সমস্ত? নোংরা হয়েছিল। বাবার পুঁথিও মায়ের কড়া ঝেড়েমুছে সাজাই। প্রণাম করি। কি আশ্চর্য, আমার শিউলী গাছে আজও ফুল ফোটে। উনি এনে দিয়েছিলেন। আমি বাবার পুঁথির ওপর ফুলটি দি! বেশ রাত হয়েচে। উনিও ডাইরি লিখচেনআমার পাশে বসে।[1]

১৯৪১-এর দিনলিপিতে উল্লিখিত ব্যক্তি ও ঘটনাবিষয়ের টীকা

১। খুকু-প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের স্নেহধন্যা বারাকপুর গ্রামবাসিনী।

২। কল্যাণী—বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা দেবীর ডাকনাম।

[1] এই তারিখের দিনলিপি কল্যাণীর লেখা হবে।

৩। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক, ‘বনস্পতির অভিশাপ’ ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

৪।গৌরীশঙ্কর-সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

৫। অপূর্ববাবু—সাহিত্যিক অপূর্বমণি দত্ত।

৬। গোপালবাবু—সাহিত্যিক গোপাল ভৌমিক।

৭। নারানদা—নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাকপুরবাসী)

৮। দেবু—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রীতিলতার স্বামী।

৯। জাহ্নবী—জাহ্নবী চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ভগ্নী।

১০। সুপ্রভা—সুপ্রভা দত্ত, অধ্যাপিকা, বিভূতি অনুরাগিণী।

১১। কানুমামা—নিরঞ্জন চক্রবর্তী, রমাদেবীর ছোটমামা।

১২। বাওবাব—আফ্রিকার বিখ্যাত বৃক্ষ, বৈজ্ঞানিক নাম Adansonia Digitata, বিভূতিভূষণের স্বপ্নের গাছ, ‘চাঁদের পাহাড়’-এ এর উল্লেখ আছে।

১৩। সুনীতিবাবু—ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৪। নীরদবাবু—ব্যবহারজীবী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, ‘সুশান্ত সা’গ্রন্থের রচয়িতা।

১৫। শৈলজা—সাহিত্যিক শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

১৬। প্রবধেন্দু—সাহিত্যিক প্রবধেন্দুনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্র চরিতনের লেখক।

১৭। দ্বিজুবাবু—দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ঘাটশিলাবাসী, এঁর বাড়িতে ‘সুবর্ণ সংঘ’ নামে সাহিত্যসংস্থা ছিল।

১৮। ২৪শে এপ্রিল—এই তারিখের দিনলিপিটুকুরমাদেবী রচিত।